

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যাভিচার ও সমকামিতার ভয়াবহ পরিণতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সমকামিতার চিকিৎসা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

১. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা:

উক্ত রোগ তথা সমকামের নেশা থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে দু' প্রকার:

১. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা:

তা আবার দু' ধরনের:

ক. দৃষ্টিশক্তি হিফায়তের মাধ্যমে: কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর যা শুধু মানুষের আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শাস্ত্রবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না। এ ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. তাতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মানা হয়। যা ইবাদতেরই একাংশ এবং ইবাদাতের মধ্যেই সমূহ মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২. বিষাক্ত তীরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর।

৩. মন সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী থাকে।

৪. মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে।

৫. অন্তরে এক ধরনের নূর তথা আলো জন্ম নেয় যার দরুন সে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই ধাবিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ مُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ৩০]

“(হে রাসূল!) আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফায়ত করে।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ضِيَاؤُهَا سَطَّ ۖ مِثْلُ نُوْرِهِ ۚ كَمِشْحَانٍ كَوْكَبٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ৩৫]

“আল্লাহ তা'আলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫]

৬. এরই মাধ্যমে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদজ্ঞান সৃষ্টি হয় যার দরুন দৃষ্টি

সংযতকারীর যে কোনো ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ তা‘আলা লুত সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে অন্তর্দৃষ্টিশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۗ﴾ [الحجر: ৭২]

“আপনার জীবনের কসম! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে তথা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৭২]

৭. এরই মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَلِلَّاهِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ৮]

“সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ তা‘আলা, তদীয় রাসূল ও (সত্যিকার) ঈমানদারদের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তো তা জানে না।” [সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْدَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ১০]

“কেউ ইজ্জত ও সম্মান চাইলে সে যেন জেনে রাখে, সকল সম্মানই তো আল্লাহ তা‘আলার। (অতএব, তাঁর কাছেই তা কামনা করতে হবে। অন্যের কাছে নয়) তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ করে এবং নেক আমল তিনিই উন্নীত করেন। [সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ১০]

সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তাঁরই নিকট সম্মান কামনা করতে হবে।

৮. তাতে করে মানব অন্তরে শয়তান ঢুকার সুগম পথটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সে তো দৃষ্টি পথেই মানব অন্তরে প্রবেশ করে খালিস্থানে বাতাস প্রবেশের চাইতেও অতি দ্রুত গতিতে। অতঃপর সে দেখা বস্তুটির সুন্দর দৃশ্যটুকু দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর মানসপটে স্থাপন করে। সে দৃষ্ট বস্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি করে যে, অন্তর তখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরনের আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। সে অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে তোলে। এমনকি সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বহু প্রকারের গুনাহের জ্বালানি ব্যবহার করে আরো উত্তপ্ত করতে থাকে। অতঃপর হৃদয়টি সেই উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার পুড়তে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত উর্ধ্ব শ্বাসের সৃষ্টি।

৯. এরই মাধ্যমে অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়। প্রবৃত্তি পুঁজায় ধাবিত হয় এবং সকল ব্যাপারে এক ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জাতীয় লোকদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُطْعَمَنَ مِنْ أَغْفَلٍ فَلَا يُبْهَتُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ২৮]

“যার অন্তরকে আমরা আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এমনকি যার কার্যকলাপ সীমিতক্রম করেছে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।” [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৮]

১০. অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার অন্তরও তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

খ. তা থেকে দূরে রাখে এমন বস্তু নিয়ে ব্যস্ততার মাধ্যমে: আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে অধিক ভয় বা অধিক ভালোবাসা। অর্থাৎ অন্যকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা না পাওয়ার আশঙ্কা করা অথবা আল্লাহ তা‘আলাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তিনি ভিন্ন অন্যকে আর ভালোবাসার সুযোগ না পাওয়া যার ভালোবাসা আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসার অধীন নয়। কারণ, এ কথা একেবারেই সত্য যে, আল্লাহ তা‘আলা মানব অন্তরে জন্মগতভাবেই এমন এক শূন্যতা রেখে দিয়েছেন যা একমাত্র তাঁরই ভালোবাসা পরিপূর্ণ করতে পারে। সুতরাং কারোর অন্তর উক্ত ভালোবাসা থেকে খালি হলে তিনি ভিন্ন অন্যদের ভালোবাসা তার অন্তরে অবশ্যই জায়গা করে নিতে চাইবে। তবে কারোর মধ্যে নিম্নোক্ত দু’টি গুণ থাকলেই সে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা নিম্নরূপ:

১. বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি। যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বস্তুকে পাওয়ার জন্য নিম্নমানের বস্তুকে ছাড়তে পারবে এবং বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ছোট বিপদ মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে।

২. ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার ওপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আঞ্জাম দিতে পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে সে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন।

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে না। অন্য কথায়, যার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা নেই সেই একমাত্র মহিলাদের অথবা শত্রুবিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে।

দুনিয়ার কোনো মানুষ যখন তাঁর ভালোবাসায় কারোর অংশীদারি সহ্য করতে পারে না তখন আল্লাহ তা‘আলা কেন তাঁর ভালোবাসায় অন্যের অংশীদারি সহ্য করবেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ভালোবাসায় শির্ক কখনোই ক্ষমা করবেন না।

ভালোবাসার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. সাধারণ সম্পর্ক জাতীয় ভালোবাসা যার দরুন এক জনের মন অন্য জনের সঙ্গে লেগে যায়। আরবী ভাষায় এ সম্পর্ককে “আলাক্বাহ” বলা হয়।

২. ভালোবাসায় মন উপচে পড়া। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “স্বাবাহ” বলা হয়।

৩. এমন ভালোবাসা যা মন থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “গারাম” বলা হয়।

৪. নিয়ন্ত্রণহীন ভালোবাসা। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “ইশক” বলা হয়। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহ তা‘আলার শানে প্রযোজ্য নয়।

৫. এমন ভালোবাসা যার দরুন প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “শাওক” বলা হয়। এমন ভালোবাসা আল্লাহ তা‘আলার শানে অবশ্যই প্রযোজ্য।

উবাদাহ ইবন সামিত, ‘আয়েশা, আবু হুরায়রা ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِلَّهِ لِقَاءَهُ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহ তা‘আলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহ তা‘আলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন না”।[1]

৬. এমন ভালোবাসা যার দরুন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকার একান্ত গোলাম হয়ে যায়। এ জাতীয় ভালোবাসাই শিকের মূল। কারণ, ইবাদতের মূল কথাই তো হচ্ছে, প্রিয়ের একান্ত আনুগত্য ও অধীনতা। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলার নিকট মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক গুণ হচ্ছে তাঁর “আদ” বা সত্যিকার গোলাম হওয়া তথা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহ তা‘আলার অধীনতা স্বীকার করা। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা জিন্ন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা ইসলামের মূল কথাও বটে। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে “আদ” শব্দে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা দাওয়াতী ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “আদ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ﴾ [الجن: ١٩]

“আর যখন আল্লাহর বান্দা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে (আল্লাহ তা‘আলাকে) ডাকার (তাঁর ইবাদত করার) জন্য দন্ডায়মান হলো তখন তারা (জিন্নরা) সবাই তাঁর নিকট ভিড় জমালো।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তা‘আলা নবুওয়াতের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “আদ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ২৩]

“আমরা আমাদের বান্দার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা যদি তাতে সন্দেহান হও তবে সেরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তা‘আলা ইসরার ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “আদ” শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْسَ لَآ مِّنَ الْأَمْسَاجِدِ الْأَحْرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الاسراء: ৮]

“পবিত্র সে সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় (বাইতুল মাকদিসে)”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত:১]

সুপারিশের হাদীসের মধ্যেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “আদ” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট সুপারিশ চাওয়া হলে তিনি বলবেন:

«إِنُّنَا مُحَمَّدًا، عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»

“তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তা‘আলার এমন এক বান্দা যার পূর্বাপর সকল গুনাহ আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।”[2]

উক্ত হাদীসে সুপারিশের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহ তা‘আলার খাঁটি বান্দা হওয়ার দরুন।

উক্ত নিরেট ভালোবাসা বান্দার নিকট আল্লাহ তা‘আলার একান্ত প্রাপ্য হওয়ার দরুন আল্লাহ তা‘আলা তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু বা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ২]

“তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু এবং সুপারিশকারী নেই”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [الانعام: ৫১]

“ওদের (মুমিনদের) জন্য তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) ভিন্ন না আছে কোনো বন্ধু আর না আছে কোনো সুপারিশকারী”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫১]

তেমনিভাবে পরকালে তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু কারোর কোনো কাজেও আসবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يُغْنِيَنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ لِيَاءً ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الجاثية: ১০]

“তাদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু সে দিন তাদের কোনো কাজেই আসবে না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি”। [সূরা আল-জাসিয়াহ, আয়াত: ১০]

মূলকথা, ভালোবাসায় আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করে সত্যিকার ইবাদত করা যায় না। তবে আল্লাহ তা‘আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা এর বিপরীত নয়। বরং তা আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাসার পরিপূরকও বটে।

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহর জন্য কাউকে দিলো এবং আল্লাহর জন্য কাউকে বঞ্চিত করলো সে যেন নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো”।[3]

এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার ওপর প্রধান্য না দিলে সে ব্যক্তি কখনো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলার জন্য কাউকে ভালোবাসা যতই কঠিন হবে ততই আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা কঠিন হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভালোবাসা আবার চার প্রকার। যে গুলোর মাঝে ব্যবধান না জানার দরুনই অনেকে এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়। আর তা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাসা, তবে তা নিরেট ভালোবাসা না হলে কখনো তা কারোর ফায়দায় আসবে না।

খ. আল্লাহ তা‘আলা যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসা। যে এ ভালোবাসায় যত অগ্রগামী সে আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসায় তত অগ্রগামী।

গ. আল্লাহ তা‘আলার জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা উক্ত ভালোবাসার পরিপূরক।

ঘ. আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্য কাউকে তাঁর সমপর্যায়ের ভালোবাসা। আর এটিই হচ্ছে শিরক।

আরো এক প্রকারের ভালোবাসা রয়েছে যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আর তা হচ্ছে স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন, স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা।

৭. চূড়ান্ত ভালোবাসা। কাউকে এমন চরমভাবে ভালোবাসা যে, প্রেমিকের অন্তরে আর কাউকে ভালোবাসার কোনো জায়গাই থাকে না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে “খুল্লাহ” এবং এ জাতীয় প্রেমিককে “খালীল” বলা হয়। আর এ জাতীয় ভালোবাসা শুধুমাত্র দু’ জন নবীর জন্যই নির্দিষ্ট। যারা হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জুন্দাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»

“তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার খলীল হোক এ ব্যাপার থেকে আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট মুক্তি চাচ্ছি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নিজ খলীল হিসেবে চয়ন করেছেন যেমনিভাবে চয়ন করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে খলীল বানাতাম তা হলে আবু বকরকেই আমার খলীল বানাতাম” [4]

খলীলের চাইতে হাবীবের মর্যাদা কখনোই উন্নত হতে পারে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কাউকে নিজ খলীল বানাননি। তবে হযরত ‘আয়েশা তার হাবীবাহ ছিলেন এবং আবু বকর, উমার ও অন্যান্যরা তাঁর হাবীব ছিলেন।

এ কথা সবার জানা থাকা প্রয়োজন যে, ভালোবাসার পাত্র আবার দু’ প্রকার, যা নিম্নরূপ:

ক. স্বকীয়ভাবে যাকে ভালোবাসতে হয়। অন্য কারোর জন্য তার ভালোবাসা নয়। আর তা এমন সত্তার ব্যাপারে হতে পারে যার গুণাবলী চূড়ান্ত পর্যায়ের ও চিরস্থায়ী এবং যা তার থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। তা একমাত্র আল্লাহ

তা‘আলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, মানুষ কাউকে দু’ কারণেই ভালোবাসে। আর তা হচ্ছে মহত্ত্ব ও পরম সৌন্দর্য। উক্ত দু’টি গুণ আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়েই রয়েছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব, একান্ত স্বকীয়ভাবে তাঁকেই ভালোবাসতে হবে। তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, সুস্থ রাখছেন, সীমাহীন করুণা করছেন, তাঁর শানে অনেক অনেক দোষ করার পরও তিনি তা লুকিয়ে রাখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দো‘আ কবুল করছেন, আমাদের সকল বিপদাপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন; অথচ আমাদের প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই বরং তিনি বান্দাকে গুনাহ করার সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁরই ছত্রছায়ায় বান্দা তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছে যদিও তা তাঁর বিধান বিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাঁকেই ভালো না বেসে আর কাকে ভালোবাসবো? বান্দার প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে শুধু কল্যাণই কল্যাণ নেমে আসছে; অথচ তাঁর প্রতি বান্দার পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় খারাপ আমলই উঠে যাচ্ছে, তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়ে বান্দার প্রিয় হতে চান; অথচ তিনি তার মুখাপেক্ষী নন। আর বান্দা গুনাহ’র মাধ্যমে তাঁর অপ্রিয় হতে চায়; অথচ সর্বদা সে তাঁর মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহর অনুগ্রহ কখনো বন্ধ হচ্ছে না। আর বান্দার গুনাহও কখনো কমছে না

দুনিয়ার কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে তার স্বার্থের জন্যই ভালোবাসে কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে ভালোবাসেন একমাত্র তারই কল্যাণে। তাতে আল্লাহ তা‘আলার কোনো লাভ নেই।

দুনিয়ার কেউ কারোর সাথে কখনো লেনদেন করে লাভবান না হলে সে তার সাথে দ্বিতীয়বার আর লেনদেন করতে চায় না। লাভ ছাড়া সে সামনে এক কদমও বাড়াচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সাথে লেনদেন করছেন একমাত্র তারই লাভের জন্য। নেক আমল একে দশ, সাতশ’ পর্যন্ত। এমনকি আরো অনেক বেশি। আর গুনাহ একে এক এবং দ্রুত মার্জনীয়।

আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্যে। আর দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র বান্দার জন্যে।

বান্দার সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁরই নিকটে। তিনিই সবচেয়ে বড় দাতা। বান্দাকে তিনি তাঁর নিকট চাওয়া ছাড়াই আশাতীত অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি বান্দার পক্ষ থেকে কম আমলে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁর নিকট তা ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন এবং গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁর নিকট বার বার কোনো কিছু চাইলে বিরক্ত হন না। বরং এর বিপরীতে তিনি তাতে প্রচুর সন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর নিকট কেউ কিছু না চাইলে খুব রাগ করেন।

আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি রক্ষা করে চলার নামই বিলায়াত। যার মূলে রয়েছে তাঁর একান্ত ভালোবাসা। শুধু সালাত, সিয়াম কিংবা মুজাহাদার নামই বিলায়াত নয়। বান্দার খারাপ কাজে তিনি লজ্জা পান। কিন্তু বান্দা তাতে একটুও লজ্জা পায় না। তিনি বান্দার গোনাহসমূহ লুকিয়ে রাখেন; কিন্তু বান্দা তার গোনাহগুলো লুকিয়ে রাখতে রাজি নয়। তিনি বান্দাকে অগণিত নি‘আমত দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেন; কিন্তু বান্দা তা করতে অস্বীকার করে। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রাসূল ও তাদের নিকট কিতাব পাঠান। এরপরও তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রতি শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেনঃ কে আছে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে সবই দেবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। তিনি বান্দার প্রতি এতো মেহেরবান যে মা-ও তার সন্তানের প্রতি এতো মেহেরবানী করে না। বান্দার তাওবা দেখে তিনি এতো বেশি খুশি হন যতটুকু খুশি হয় না সে ব্যক্তিও যে ধু ধু মরুভূমিতে

খাদ্য-পানীয়সহ তার সওয়ারী হারিয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছে। তাঁর আলোকে দুনিয়া আলোকিত। তিনি সর্বদা জাগ্রত। তাঁর জন্য কখনো ঘুম শোভা পায় না। তিনি সত্যিকার ইনসাফগার। তাঁর নিকট রাত্রের আমল উঠে যায় দিনের আমলের পূর্বে। দিনের আমল উঠে যায় রাত্রের আমলের পূর্বে। নূরই তাঁর আচ্ছাদন। সে আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে তাঁর চেহারার আলোকরশ্মি তাঁর দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসতে হবে।

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নি‘আমত হবে সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষাৎলাভ। আর আত্মার সর্বচূড়ান্ত স্বাদ তাতেই নিহিত রয়েছে। তা এখন থেকেই তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসার মধ্যেই দুনিয়াতে আত্মার সমূহ তৃপ্তি নিহিত। এটাই মু‘মিনের জন্য দুনিয়ার জান্নাত। এ কারণেই আলিমগণ বলে থাকেন: দুনিয়ার জান্নাত যে পেয়েছে আখিরাতের জান্নাত সেই পাবে। তাই আল্লাহ প্রেমিকদের কারো কারোর কখনো কখনো এমন ভাব বা মজা অনুভব হয় যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয় যে, এমন মজা যদি জান্নাতীরা পেয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চই তাঁরা সুখে রয়েছেন।

খ. অন্যের জন্য যাকে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসতে হলে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই ভালোবাসতে হবে। স্বকীয়ভাবে নয়। তবে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা কখনো মনের বিপরীতও হতে পারে। তবে তা তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই মেনে নিতে হবে যেমনিভাবে সুস্থতার জন্য অপছন্দ পথ্য খাওয়া মেনে নিতে হয়।

অতএব, সর্ব নিকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে ভালোবাসা। আর সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসার বস্তুকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া।

ভালোবাসাই সকল কাজের মূল। চাই সে কাজ ভালোই হোক বা খারাপ। কারণ, কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলেই তার মর্জিমাফিক কাজ করতে ইচ্ছা হয় এবং কোনো বস্তুকে ভালোবাসলেই তা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্মোদ্যোগী হয়। সুতরাং সকল ধর্মীয় কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যেমনিভাবে সকল ধর্মীয় কথার মূল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসের অপূর্ব স্বীকৃতি।

কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য লাভজনক প্রমাণিত হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য লাভজনক হতে বাধ্য। আর কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য ক্ষতিকর হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য। তাই আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা বান্দার কল্যাণেই আসবে। ঠিক এরই বিপরীতে কোনো সুন্দরী মেয়ে অথবা শূশ্রূবিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা কখনোই বান্দার কল্যাণে আসবে না। বরং তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে। সুন্দরী কোনো নারী অথবা শূশ্রূবিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, কখনো আল্লাহ তা‘আলার অধিকার ও তার অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে তার অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার জন্য মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করা হয়, অথচ আল্লাহ তা‘আলার জন্য মূল্যহীন সম্পদ, তার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করা হয় যা আল্লাহ তা‘আলার জন্য করা হয় না, সর্বদা তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয় ; অথচ আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের এতটুকুও চেষ্টা করা হয় না এমন ভালোবাসা বড় শিক্র যা ব্যাভিচার চাইতেও অত্যন্ত মারাত্মক।

ফুটনোট

- [1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০৭, ৬৫০৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮৩, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬
- [2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩
- [3] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮১; ত্বাবরানী/কাবীর, হাদীস নং ৭৬১৩, ৭৭৩৭, ৭৭৩৮
- [4] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9580>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন